مُحْبِطَاتُ الْأَعْمَالِ গ্রন্থের অনুবাদ

আমল ধ্বংসের কারণ

শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম নাঈম رحمه الله

অনুবাদ : মাওলানা আসাদ আফরোজ

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

সূচি

অনুবাদকের কথা ০৭

ভূমিকা ০৯

আমল ধ্বংসের কারণগুলোর বিবরণ

১. কুফর ১১

কুফরের কিছু প্রকার, যার দরুন আমল নষ্ট হয়ে যায় ১৭

ক) দ্বীন এবং দ্বীনদার মানুষদের নিয়ে বিদ্রুপ করা ১৭

খ) দ্বীনের কোনো বিষয় অপছন্দ করা ১৭

গ) আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজে লিপ্ত হওয়া এবং তাঁর পছন্দনীয় আমল অপছন্দ করা ১৮

২. শির্ক ১৯

৩. আল্লাহর হারাম-করা-বিষয়ে গোপনে লিপ্ত হওয়া ২৩

৪. আল্লাহর নামে কসম করে বদদুআ দেওয়া ২৯

৫. রিয়া অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর জন্য আমল করা ৩৭

৬. নবি ﷺ-এর নিকট আওয়াজ উঁচু করা ৪৮

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার চেয়ে অগ্রগামী হওয়া ৫৩

৮. আসরের সালাত পরিত্যাগ করা ৫৫

৯. দান করে খোঁটা দেওয়া ৫৭

১০. মানুষের হক নষ্ট করা এবং জুলুম করা ৬৫

১১. ভাগ্য-গণনা ও জাদু করা ৭৩

১২. মদ পান করা ৮০

১৩. সুদ খাওয়া ৮৭

১৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ৯৫

১৫. কুকুর লালনপালন করা ১০৪

১৬. তাকদীর অস্বীকার করা ১০৭

১৭. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ১০৯

১৮. স্বামীর কথা অমান্য করা ১১০

১৯. লোকজন অপছন্দ করা সত্ত্বেও ইমামতি করা ১১২

শেষকথা ১১৪

আমল ধ্বংসের কারণগুলোর বিবরণ

০১

কুফর

আমল ধ্বংসকারী প্রতিটি গুনাহ্ থেকে একজন মুসলিম সবচেয়ে বেশি সতর্ক ও সজাগ থাকবে। কারণ কিয়ামাতের দিন সেগুলোর কারণে বরবাদ হয়ে যেতে পারে তার সমস্ত সাওয়াব ও প্রতিদান। যে সমস্ত গুনাহ্ বান্দার জীবনের সমগ্র নেক কাজ ধ্বংস করে দেয় এবং তাকে দ্বীন থেকে বের করে আনে, তার মধ্যে প্রধানতম হলো—কুফরি করা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন। তিনি বলেছেন,

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا ۚ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

“তারা সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে; যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং মৃত্যুবরণ করবে কাফির অবস্থায়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর তারাই হবে জাহান্নামের বাসিন্দা এবং তারা সেখানে বাস করবে চিরকাল।”[১]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেছেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴿٥﴾

“যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎকর্ম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে হবে নিঃস্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত।”[২]

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২১৭।
[২] সূরা আ'রাফ, ৫ : ৫।

০৩

আল্লাহর হারাম-করা-বিষয়ে গোপনে লিপ্ত হওয়া

সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُوْرًا

"অবশ্যই আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে জানি, যারা কিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমপরিমাণ নেক আমল নিয়ে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেবেন।"

সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে তাদের পরিচয় বর্ণনা করুন, যাতে নিজের অজান্তেই আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যাই।'

জবাবে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ وَلٰكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوْهَا

"শুনে রাখো! তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই একটি দল। রাতের বেলায় তারা তোমাদের মতোই ইবাদাত করে। কিন্তু তারা এমন লোক, একান্ত গোপনে যারা আল্লাহর হারাম-করা-বিষয়ে লিপ্ত হয়।"[১]

[১] ইবনু মাজাহ, ৪২৪৫।

উপরিউক্ত হাদীসে ব্যবহৃত مَحَارِمُ اللهِ দ্বারা আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ-করা-ছোটোবড়ো সকল হারাম কাজকে বোঝানো হয়েছে।

যেখানে স্বয়ং নবিজির সাহাবি সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু) গোপনে পাপাচারে লিপ্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা করেছেন, সেখানে আমাদের অবস্থা তো সহজেই অনুমান করা যায়! বহুবিধ অপরাধ আর পাপাচারে ভরে গেছে আমাদের জীবন। চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে মন্দপ্রবৃত্তির চাহিদা আর অবৈধ আশা-আকাঙ্ক্ষা। অন্তরে ঈমানের শক্তিও হয়ে গেছে বিলীনপ্রায়। তবে যাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেছেন, তাদের কথা আলাদা।

লক্ষ করুন—সাহাবি সাওবান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রশ্নের জবাবে নবিজি এমন কথা বলেছেন, যা কারও কল্পনাতেও ছিল না। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন—সেই গোপন পাপাচারে লিপ্ত লোকগুলো মুসলমানদেরই অন্তর্ভুক্ত। এমনকি তাদের অনেক ভালো আমলও আছে। তারা লোক সমাগমে নিজেদের উপস্থাপন করে উত্তম ও ভালো মানুষ রূপে; অথচ নির্জনে আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে অবলীলায়।

আল্লাহ তাআলা যে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিসের ব্যাপারেও জানেন এবং তাঁর অগোচরে থাকে না কোনোকিছুই—তখন এই বিষয়টি তারা ভুলে যায় কিংবা ভুলে যাওয়ার ভান ধরে থাকে। সেই মুহূর্তে তাদের অন্তরে ততটুকু তাকওয়া ও আল্লাহর ধ্যান অবশিষ্ট থাকে না, যতটুকু থাকলে তারা হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

ফলে পাপকর্ম তাদের সব পুণ্যকর্মকে খেয়ে ফেলে। তাদের নেক আমল ও পুণ্যকর্ম রূপান্তরিত হয় ধূলিকণায়। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেখিয়ে দেবেন—তাদের নেক আমলের পরিমাণ হয়েছে পাহাড়সম। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে নির্জনে হারামে নিমগ্ন থাকার কারণে তাদের চোখের সামনেই তা ধূলিসাৎ করে দেবেন তিনি। এতে তাদের আফসোস আর অনুশোচনা কেবল বৃদ্ধিই পাবে।

০৫

রিয়া অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর জন্য আমল করা

রিয়া তথা মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করাকে ছোটো শির্ক হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি চোখে দেখা যায় না, অন্তরের গভীরে লুকানো থাকে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই রিয়ার মতো অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। রিয়া কী, আমাদের আমলের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব কতটুকু, আর কী কী উপায়ে এটি থেকে মুক্ত থাকতে পারি—এ বিষয়গুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব, ইন শা আল্লাহ।

রিয়া হলো শির্ক। এটিকে বরং বলা যায় গোপন শির্ক। আর এর সংজ্ঞা হলো—মানুষের সামনে নিজের ইবাদাত-বন্দেগি ও নেক আমল প্রকাশ করা, যাতে এর মাধ্যমে দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় কিংবা পাওয়া যায় মানুষের প্রশংসা ও সাধুবাদ। اَلرِّيَاءُ (লোক দেখানো প্রবণতা) শব্দটি এসেছে اَلرُّؤْيَةُ (দেখা বা তাকানো) থেকে। যেমন : اَلسُّمْعَةُ (সুখ্যাতি) শব্দটি এসেছে اَلسَّمَاعُ وَالْاِسْتِمَاعُ (শ্রবণ করা) থেকে।

এ কারণেই اَلْمُرَائِي বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে শুধু মানুষকে দেখানোর ইচ্ছায় নিজেকে ভালো রূপে হাজির করে। আর اَلْمُسَمِّعُ বলা হয় তাকে, যার উদ্দেশ্য থাকে—মানুষের মাঝে তার উত্তম গুণাবলি আর ভালো কাজগুলো ছড়িয়ে পড়ুক এবং সবাই শ্রবণ করুক তার ভালোমানুষির কথা। রিয়াকারী ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে দুনিয়াতেই লাভ করতে চায় নিজের অর্জন, আর দেশ ও দশের কাছে পেতে চায় সাধুবাদ ও সম্মান।

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত তাঁর সাহাবিদের ব্যাপারে রিয়ার ভয়

করেছেন, অথচ তাঁরা ছিলেন এই উম্মাহর সবচেয়ে উত্তম ও আল্লাহভীরু সম্প্রদায়। তিনি তাদের জন্য দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও রিয়াকে বেশি ভয়ানক বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের পূর্বসূরি নেককার মনীষীগণ রিয়ার আশঙ্কায় কিছু কিছু নেক আমল এমনভাবে করতেন, যাতে একজনও টের না পায়।

কিন্তু কিছু মানুষ আবার লোক দেখানো প্রবণতাকে এত তীব্রভাবে ভয় করে যে, এর ফলে আমল করাই ছেড়ে দেয়। কেউ মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত করার ইচ্ছা করে, কিন্তু শয়তান তার কাছে এসে বলে, 'তুমি তো লোক দেখানো তিলাওয়াতকারী!' ফলে তিলাওয়াত পরিত্যাগ করে সে। এটা আসলে শয়তানের একটা কূটচাল ও কুমন্ত্রণা। কারণ সে চায়—আপনি আল্লাহর আনুগত্য করা ছেড়ে দিন, যাতে আপনার নেক আমল কম হয়।

সুতরাং যখন তা টের পাবেন, তখন আপনার জন্য জরুরি হলো—শয়তান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং ইবাদাত চালিয়ে যাওয়া। এভাবে আমল করতে থাকলে অচিরেই আপনার থেকে সকল কুমন্ত্রণা ও সংশয় দূর হয়ে যাবে। অন্তরে লোক দেখানোর প্রবণতা আর থাকবে না। আপনি তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় নিশ্চিন্তমনে ইবাদাত করতে পারবেন।

কখনো কখনো উপকারী ও কল্যাণকর বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আমল প্রকাশ করা মুস্তাহাব, যাতে অন্যান্যদের জন্য তা আদর্শ হিসেবে কাজ করে। তখন জনসম্মুখেই দান-সদাকা করা উচিত, যেন অন্যান্য সামর্থ্যবান ধনী ব্যক্তিরাও দান করার অনুপ্রেরণা পায় এবং সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসে তারা।

সুতরাং যখন কল্যাণকর কোনো বিষয় সামনে আসে, তখন নিজের নেক আমল প্রকাশ করতে কোনো সমস্যা নেই এবং সে ক্ষেত্রে লোক দেখানোর ভয় করা উচিতও নয়। কারণ যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজের প্রচলন ঘটায়, সে তার নিজের সাওয়াবও পায় এবং তার পরে যারা সেই কাজে অংশগ্রহণ করে, তাদের সাওয়াবও সে পেতে থাকে কিয়ামাত পর্যন্ত।

রিয়া বা লোক দেখানো আমল হলো ছোটো শির্ক। আর রিয়ার পরিচয় হলো কোনো নেক আমলের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে অন্যের সন্তুষ্টি অর্জন করার ইচ্ছা করা। অথবা ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং অন্যের সন্তুষ্টি; উভয়ই লাভ করার নিয়ত করা। এই দুটি প্রকারই আল্লাহকে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত করে। লোক দেখানো

আমলের দরুন কঠোর শাস্তি দেবেন তিনি। এর পাশাপাশি লোক দেখানো আমলকারীর নেক আমল, পরিশ্রম আর চেষ্টা-মুজাহাদাগুলোও বাতিল করে দেবেন।

আমাদের সামনে এখন এটা সুস্পষ্ট—রিয়া হলো নেক কাজসমূহকে ধ্বংসকারী একটি গুনাহ। যে আমলে রিয়া করা হয়, তা সেই আমলের প্রতিদান নষ্ট করে দেয়। দেখুন—হাদীসে বর্ণিত সেই জিহাদকারীর জিহাদ কীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ জিহাদ করার দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল—লোকে তাকে সাহসী বীরপুরুষ বলবে। সেই ক্বারী সাহেবের বিষয়টি নিয়েও ভাবুন, যে সারারাত ধরে সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করত, অথচ তার সালাত আর তিলাওয়াতের সাওয়াব কীভাবে নস্যাৎ হয়ে গেছে! আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন।

এখন প্রশ্ন হলো—রিয়া ও অহংকার থেকে মুক্ত থেকে আমাদের আমলগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করার উপায় কী?

উত্তর হলো—এর তিনটি উপায় রয়েছে :

প্রথম উপায় : নিজের মধ্যে এই ধ্যান-খেয়াল সৃষ্টি করুন—আপনি আল্লাহ তাআলার ইবাদাত-বন্দেগি করছেন একমাত্র তাঁকেই সন্তুষ্ট করতে এবং তাঁর সাওয়াব লাভের আশায়। আপনি কারও প্রশংসা বা সাধুবাদ পাওয়ার কামনা করবেন না। প্রকাশ্যেও নয়, গোপনেও নয়।

ভালোভাবে স্মরণ রাখুন—কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষ মিলেও আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না। মাত্র একটি নেকিও আপনাকে দেবে না কেউ সেদিন। তখন আপনার উপলব্ধি হবে—মানুষজন আপনার ইবাদাত সম্পর্কে জানুক বা না জানুক; তাতে কোনো লাভই নেই আপনার। তারা আপনার প্রশংসা করুক বা নিন্দা করুক; তাতে আপনার কিছু যায়-আসে না। বরং তাতে আপনার অপূরণীয় ক্ষতিই রয়েছে কেবল।

হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন রিয়াকারী লোকদের উদ্দেশে বলবেন,

اِذْهَبُوْا إِلَى مَا كُنْتُمْ تُرَآءَوْنَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ مِنْ جَزَاءٍ؟

"দুনিয়াতে তোমরা যাদেরকে দেখানোর জন্য ইবাদাত করতে, তাদের কাছে যাও—দেখো, তাদের নিকট কোনো প্রতিদান পাও কি না?"[১]

[১] দেখুন—আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৩৬৩৬; মিশকাত, ৫৩৩৪।

সাহাবিগণ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরের নিকট নিজেদের আওয়াজ সব সময় নিচু করে রাখতেন। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মসজিদে নববিতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় এক লোক একটা নুড়ি নিক্ষেপ করলেন আমার দিকে। আমি তাকিয়ে দেখলাম—তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব। তিনি বললেন, 'যাও, ওই দুজন ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো।'

আমি তাদের নিয়ে এলাম তার নিকট। তিনি বললেন, 'তোমরা কারা? তোমরা কোথা থেকে এসেছে?' তারা বলল, 'আমরা তায়েফের অধিবাসী।' তিনি বললেন, 'তোমরা যদি মদীনার লোক হতে, তবে অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। কারণ তোমরা দুজন আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মসজিদের ভেতরে উচ্চস্বরে কথা বলছিলে!"[১]

খলীফা আবূ জা'ফর একবার মসজিদে নববিতে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর সাথে ফিক্হের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলেন। তখন ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) খলীফা আবূ জা'ফরকে বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এই মসজিদে কক্ষনো আপনার আওয়াজ উঁচু করবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা এক সম্প্রদায়কে আদব শিক্ষা দিয়েছেন—

لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

"তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না।"[২]

আরেক সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى

"যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে—তারাই সেসব লোক, যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছেন।"[৩]

এবং আরেক সম্প্রদায়কে ভর্ৎসনা করেছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾

[১] বুখারি, ৪৭০।
[২] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ২।
[৩] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৩।

> “(হে নবি!) গৃহের বাইরে থেকে যারা তোমাকে ডাকাডাকি করতে থাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।”[৪]

ইন্তিকালের পরও আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মান ও মর্যাদা ঠিক তাঁর জীবিত অবস্থার মতোই সম্মানিত ও মর্যাদাবান।’ ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর এই কথা শুনে খলীফা আবূ জা’ফর অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী হন এবং নিজের আওয়াজ নিচু করে রাখেন।[৫]

কতিপয় আলিম অভিমত পেশ করেছেন—যখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসসমূহ শ্রবণ করা হয়, তখনো এই আদেশ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কুরতুবি (রহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীর গ্রন্থে ইবনুল আরাবি (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথা উল্লেখ করেন,

‘মৃত অবস্থায় নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা ও সম্মান, জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের ন্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শোনা, জীবিত অবস্থায় সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শোনার ন্যায় মর্যাদা রাখে। সুতরাং যখন নবিজির বাণী পাঠ করা হয়, তখন উপস্থিত সকলের জন্য ওয়াজিব হলো—তাঁর বাণীর ওপর নিজের আওয়াজ উঁচু করবে না। মজলিসে উপস্থিত অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে শুনে যেভাবে এগুলো মান্য করা জরুরি ছিল, ঠিক সেভাবে মান্য করবে।’[৬]

এ কারণে আমাদের জন্য আবশ্যক—আমরা আদব বজায় রেখে সেই ইলমি মজলিসগুলোতে অবস্থান করব, যেখানে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস পাঠ করা হয়। সেখানে আমরা অনর্থক গল্প-গুজব করব না, হাসি-তামাশা থেকে বেঁচে থাকব এবং আমাদের আওয়াজ নিচু ও সংযত রাখব; যেন নিজের অজান্তেই আমাদের আমলগুলো বরবাদ হয়ে না যায়।

---

[৪] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৪।
[৫] কাজী ইয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুকূকিল মুসতাফা, ২/৯২।
[৬] কুরতুবি, তাফসীর, ১৬/৩০৭।

০৬

নবি ﷺ-এর নিকট আওয়াজ উঁচু করা

যে সমস্ত কারণে নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়, তার মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো—নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আওয়াজ উঁচু করা। আল্লাহ তাআলা সাবধান করেছেন—যে ব্যক্তি তার আওয়াজকে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আওয়াজের চেয়ে উঁচু করবে, তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা সূরা হুজুরাতে বলেছেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْآ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٢

> “ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং একে অপরের সাথে তোমরা যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমলগুলো বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা তা টেরও পাবে না।”[১]

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক সাহাবি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি আশঙ্কা করতে লাগলেন—তাঁর সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তিনি কিছুটা উঁচু আওয়াজের অধিকারী ছিলেন। আনাস ইবনু মালিক (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো—“ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না...। তখন সাবিত ইবনু কাইস (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিজের ঘরে বসে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, ‘আমি একজন

[১] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ২।

জাহান্নামি!’ এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন তিনি। একদিন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা’দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا أَبَا عَمْرٍو مَا شَأْنُ ثَابِتٍ، اِشْتَكَى؟

“হে আবূ আমর! সাবিতের কী খবর? সে কি অসুস্থ?”

সা’দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ‘সে আমার প্রতিবেশী, তার কোনো অসুখ হয়েছে বলে তো আমি জানি না।’

এরপর সা’দ (রদিয়াল্লাহু আনহু) সাবিত ইবনু কাইস-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্য উল্লেখ করলেন। তখন সাবিত (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ‘এই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আর তোমরা তো জানো রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর আমার কণ্ঠস্বরই উঁচু হয়ে যায় সবচেয়ে বেশি। সুতরাং আমি তো জাহান্নামি।’ সা’দ ইবনু মুআয (রদিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে সাবিত ইবনু কাইসের সেই কথা বললেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

“না, সে বরং জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত।”

শেষে আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘এরপর থেকে আমরা তাকে ভাবতাম—একজন জান্নাতি লোক, যিনি আমাদের মাঝে হাঁটাচলা করছেন।”[২]

এখন প্রশ্ন হলো—নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর এই নিষেধাজ্ঞা কি আমাদের থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, নাকি এখনো বলবৎ রয়েছে? আমরা এই প্রশ্নের জবাব পেতে পারি সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর জীবনীতে। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর এই ব্যাপারে কেমন ছিল তাদের আমল, কুরআনের এই আয়াত থেকে তারা কী অনুধাবন করেছিলেন ইত্যাদি জানার মাধ্যমে।

সাহাবিগণ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবরের নিকট নিজেদের

[২] বুখারি, ৩৬১৩; মুসলিম, ১১৯।

আওয়াজ সব সময় নিচু করে রাখতেন। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মসজিদে নববিতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় এক লোক একটা নুড়ি নিক্ষেপ করলেন আমার দিকে। আমি তাকিয়ে দেখলাম—তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব। তিনি বললেন, 'যাও, ওই দুজন ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো।'

আমি তাদের নিয়ে এলাম তার নিকট। তিনি বললেন, 'তোমরা কারা? তোমরা কোথা থেকে এসেছে?' তারা বলল, 'আমরা তায়েফের অধিবাসী।' তিনি বললেন, 'তোমরা যদি মদীনার লোক হতে, তবে অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। কারণ তোমরা দুজন আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মসজিদের ভেতরে উচ্চস্বরে কথা বলছিলে!"[৩]

খলীফা আবূ জা'ফর একবার মসজিদে নববিতে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর সাথে ফিক্‌হের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলেন। তখন ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) খলীফা আবূ জা'ফরকে বলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এই মসজিদে কক্ষনো আপনার আওয়াজ উঁচু করবেন না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা এক সম্প্রদায়কে আদব শিক্ষা দিয়েছেন—

لَا تَرْفَعُوْٓا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

"তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না।"[৪]

আরেক সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ

"যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে—তারাই সেসব লোক, যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছেন।"[৫]

এবং আরেক সম্প্রদায়কে ভর্ৎসনা করেছেন—

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤﴾

"(হে নবি!) গৃহের বাইরে থেকে যারা তোমাকে ডাকাডাকি করতে থাকে,

[৩] বুখারি, ৪৭০।
[৪] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ২।
[৫] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৩।

তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।”[৬]

ইন্তিকালের পরও আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মান ও মর্যাদা ঠিক তাঁর জীবিত অবস্থার মতোই সম্মানিত ও মর্যাদাবান।’ ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর এই কথা শুনে খলীফা আবূ জা’ফর অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী হন এবং নিজের আওয়াজ নিচু করে রাখেন।[৭]

কতিপয় আলিম অভিমত পেশ করেছেন—যখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসসমূহ শ্রবণ করা হয়, তখনো এই আদেশ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কুরতুবি (রহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীর গ্রন্থে ইবনুল আরাবি (রহিমাহুল্লাহ)-এর কথা উল্লেখ করেন,

‘মৃত অবস্থায় নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা ও সম্মান, জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের ন্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শোনা, জীবিত অবস্থায় সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শোনার ন্যায় মর্যাদা রাখে। সুতরাং যখন নবিজির বাণী পাঠ করা হয়, তখন উপস্থিত সকলের জন্য ওয়াজিব হলো—তাঁর বাণীর ওপর নিজের আওয়াজ উঁচু করবে না। মজলিসে উপস্থিত অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে শুনে যেভাবে এগুলো মান্য করা জরুরি ছিল, ঠিক সেভাবে মান্য করবে।’[৮]

এ কারণে আমাদের জন্য আবশ্যক—আমরা আদব বজায় রেখে সেই ইলমি মজলিসগুলোতে অবস্থান করব, যেখানে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস পাঠ করা হয়। সেখানে আমরা অনর্থক গল্প-গুজব করব না, হাসি-তামাশা থেকে বেঁচে থাকব এবং আমাদের আওয়াজ নিচু ও সংযত রাখব; যেন নিজের অজান্তেই আমাদের আমলগুলো বরবাদ হয়ে না যায়।

---

[৬] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ৪।
[৭] কাজী ইয়ায, আশ-শিফা বি-তা’রীফি হুকূকিল মুসতাফা, ২/৯২।
[৮] কুরতুবি, তাফসীর, ১৬/৩০৭।

০৮

আসরের সালাত পরিত্যাগ করা

যেসব গুনাহে লিপ্ত হলে মানুষের আমল নষ্ট হয়ে যায় বলে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করেছেন, সেরকম একটি গুনাহ হলো—আসরের সালাত পরিত্যাগ করা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে নিয়মিত হেফাজত করার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আসরের সালাতের অধিক গুরুত্বের কারণে আলাদা করে বিশেষভাবে হুকুম করেছেন তা হেফাজত করার। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

> "সমস্ত নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে দাঁড়াও একান্ত আদবের সাথে।"[১]

আবুল মালীহ (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, 'মেঘাচ্ছন্ন একটি দিনে বুরাইদা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে একটি জিহাদে অংশ নিয়েছিলাম আমরা। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা আসরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করে নাও। কারণ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

> "যে ব্যক্তি আসরের সালাত পরিত্যাগ করে, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়।"[২]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু

---

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২৩৮।
[২] বুখারি, ৫৫৩; নাসাঈ, ৪৭৪; ইবনু মাজাহ, ৬৯৪।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

> "যে ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে গেল, তার পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ সবকিছুই যেন ধ্বংস হয়ে গেল।"[৩]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আসরের সালাত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর আদায় করে, কিয়ামাতের দিন সে তীব্র আফসোস, অনুশোচনা ও কঠিন যন্ত্রণা অনুভব করবে। চোখের পলকেই যে ব্যক্তি হারিয়ে ফেলে তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ, সেই ব্যক্তির মতোই হবে তার অনুভূতি।

"যে ব্যক্তি আসরের সালাত পরিত্যাগ করে, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়"—নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণীর অর্থ কী? তিনি কি এর মাধ্যমে ওই ব্যক্তির সমস্ত আমল নষ্ট হওয়াকে বুঝিয়েছেন, নাকি আমলের একাংশকে? এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো সীমা উল্লেখ করেননি নবিজি।

তিনি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন—যে আসরের সালাত ছেড়ে দেয়, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে হাদীসটিকে কোনো নির্দিষ্টকরণের সাথে সম্পৃক্ত না করে সাধারণভাবে বহাল রাখাই সমীচীন হবে, যেন আসরের সালাতে অবহেলাকারীর জন্য এই হাদীসটি সতর্ককারী হিসেবে ভূমিকা রাখে।

সুতরাং সেসকল ব্যক্তির অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত—যারা কাজকর্ম শেষ করে যোহরের পর ঘরে ফেরেন, অতঃপর আসরের সালাত না পড়েই ঘুমিয়ে যান। এরপর মাগরিবের সালাত শেষে তা আদায় করে নেন। আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত তাদের। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন।

---

[৩] বুখারি, ৫৫২; মুসলিম, ৬২৬।

০৯

দান করে খোঁটা দেওয়া

নিশ্চয় অধিকাংশ ব্যবসায়ী যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, তা হলো—লাভ না হয়ে লোকসান হওয়া এবং পুঁজি হারানোর ভয়; তা যেকোনো ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনে হতে পারে। সুতরাং ওই ব্যবসায়ীর অনুভূতি কেমন হবে এবং কত বেশি হবে তার আফসোসের পরিমাণ, যখন তাকে বলা হবে—'আপনার সারা জীবনের উপার্জিত সমস্ত অর্থসম্পদ আপনি ভুয়া ব্যাংকে জমা রেখেছেন, ফলে সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে?'

কিয়ামাতের দিন কিছু মুসলিম এরকম অবস্থার মুখোমুখি হবে। তখন অবশ্য তাদের কোনো অর্থসম্পদ অদৃশ্য হয়ে যাবে না, বরং তাদের সমস্ত নেক আমল বা তার কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ তারা তাদের জীবদ্দশায় এমন কিছু গুনাহে লিপ্ত ছিল, যেগুলো সেদিন তাদের পুণ্যকর্মসমূহ বাতিল করে দেবে।

নেক আমল ও পুণ্যকর্ম ধ্বংস করে দেয়, এরকম একটি গুনাহ হলো—দান করে খোঁটা দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى ۙ كَالَّذِیْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ ۖ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَیْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾
>
> "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সেই ব্যক্তির মতো অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-সদাকাগুলো বরবাদ করো না, যে নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আসলে এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের ন্যায়, যার ওপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, ফলে তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিলো। তারা যা উপার্জন করেছে, তার কোনো সাওয়াব তারা পায় না। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"[১]

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২৬৪।

আবার কেউ কেউ তার সহকর্মীর উপকার করে খোঁটা দেয়। সে তাকে বলে—'আমি সুপারিশ করেছি আপনার জন্য', 'আমি আপনার এমন একটা কাজ করে দিয়েছি, যেটা আপনি নিজে করতে পারতেন না।' অথবা সে বলে—'অমুক এই কাজের যোগ্য নয়, তার উপকার করা বৃথা। আমি তাকে অমুক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়নি।'

অনেকেই আবার সাহায্য চেয়ে কোনো কারণে না পেলে স্মরণ করিয়ে দিতে শুরু করে—কী কী অনুগ্রহ সে করেছিল। অমুক তারিখে এত টাকা ধার দিয়েছিল, অমুক অমুক কাজ করে দিতে এগিয়ে এসেছিল ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে সেই কাজগুলো সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেনি, বরং তা নিছক বন্ধক হিসেবে রেখেছিল, যেন নিজ প্রয়োজনের সময় ফেরত নিতে পারে।

এই সমস্ত উদাহরণের সবগুলোই হলো অনুগ্রহ করে খোঁটা দেওয়া ও অপমান করার নামান্তর। এগুলোর দরুন সেই অনুগ্রহের সাওয়াব ও প্রতিদান নস্যাৎ হয়ে যায়। অনুগ্রহ প্রকাশ করে খোঁটা দেওয়া কবীরা গুনাহগুলোর একটি। আবূ যার গিফারি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَلْمَنَّانُ الَّذِىْ لَا يُعْطِىْ شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না—

ক) খোঁটাদানকারী; যে দান করে কেবল খোঁটা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই।

খ) মিথ্যা কসম করে পণ্য-বিক্রয়কারী এবং

এবং যার মাধ্যমে চাওয়া হলে তিনি দান করেন।"[২]

আবূ উমামা বাহিলি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَّا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا : عَاقٌّ وَّمَنَّانٌ وَّمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ

"আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির ফরজ-নফল কোনো আমলই কবুল করবেন না—

[২] নাসাঈ, ১৩০০; আবূ দাঊদ, ১৪৯৫; ইবনু মাজাহ, ৩৮৫৮।

ক) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।

খ) অনুগ্রহ করে খোঁটাদানকারী এবং

গ) তাকদীর অস্বীকারকারী।”[৩]

আল্লাহ তাআলা তাদের ফরজ-নফল কোনো আমলই কবুল না করার কারণ—এর আগেই যে তাদের সমস্ত নেক আমল নস্যাৎ হয়ে গেছে।

এই আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিক হলো—‘আমি যথেষ্ট ইবাদাত করেছি’ প্রতিটি মুসলিমের জন্য এই ধরনের মনোভাব পরিত্যাগ করা জরুরি। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও নেক আমল করা থেকে বিরত রাখে এবং মানুষকে অলসতার দিকে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন আমাদের। তিনি বলেছেন,

وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ۝٦

“দান করে (আল্লাহর প্রতি) বিরাট অনুগ্রহ করেছেন—এমনটি মনে করবেন না।”[৪]

এই আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন মুফাসসিরগণ। সেটি হলো—‘আপনি দান করে এই প্রত্যাশায় বসে থাকবেন না যে, তার চেয়েও বেশি দেওয়া হবে আপনাকে।’

এই সমস্ত দলীল-প্রমাণ স্মরণ রাখুন ভালোভাবে। এর সবগুলোই নেওয়া হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ হতে। এগুলো যেন আমাদের হৃদয়ে সর্বদা প্রহরী হিসেবে জাগ্রত থাকে, যাতে অজান্তেই আমাদের আমলগুলো নষ্ট হয়ে না যায়।

[৩] ইবনু আবী আসিম, আস-সুন্নাহ, ৩২৩; সুয়ূতি, আল-জামিউস সগীর, ৫৩৭৬।

[৪] সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৬।

১১

ভাগ্য-গণনা ও জাদু করা

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘কয়েকজন লোক আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَيْسُوْا بِشَيْءٍ

“ওরা কিছুই নয়।”

তারা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো অনেক সময় এমন কথা বলে, যা বাস্তবে ঘটে যায়!’

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا فِيْ أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِّائَةِ كَذْبَةٍ

“সেই সত্য কথাটি জিন থেকে পাওয়া। জিনেরা তা (আসমানের ফেরেশতাদের থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে এসে তাদের বন্ধু গণকদের কানে তুলে দেয়, যেভাবে মুরগি তার বাচ্চাদের মুখে দানা তুলে দেয়। তারপর গণকরা এর সঙ্গে মিশিয়ে দেয় আরও শতাধিক মিথ্যা কথা।”[১]

যে ব্যক্তি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ অমান্য করে গণকের নিকট যাবে, তার ৪০ দিনের সালাতের সাওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সফিয়্যা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

[১] বুখারি, ৬২১৩; মুসলিম, ২২২৮।

> "যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্‌বক্তা বা গণকের নিকট গেল এবং তাকে কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করল, চল্লিশ রাত্রি তার কোনো সালাত কবুল করা হবে না।"[২]

সুতরাং গণককে শুধু জিজ্ঞেস করার কারণে; তার সাথে দেখা করে হোক বা ফোনে যোগাযোগ করে হোক, আপনার চল্লিশ দিনের সালাতের সাওয়াব ও প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাবে। তা হলে ভাবুন—এর ক্ষতি কত বড়ো আর কত কঠিন এর শাস্তি! আর যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করল, সে তো সরাসরি কুফরে লিপ্ত হলো। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন! আবূ হুরায়রা ও হাসান (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

> "যে ব্যক্তি গণক/ভবিষ্যদ্‌বক্তার নিকটে গেল, অতঃপর সে যা বলল, তা বিশ্বাসও করল—তা হলে সেই ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতি কুফরি করল।"[৩]

সম্মানিত আলিমগণ বলেছেন, 'সে যদি তা হালাল মনে করে, তা হলে সে সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়েছে। আর যদি তার কথার প্রতি বিশ্বাসী না হয়, তবে সেটা হবে ছোটো কুফর।'

লোকজন প্রায়ই জাদুকর এবং গণকদের কাছে যায়, যখন তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ডাক্তারের কাছে কোনো চিকিৎসা পায় না। তারা কতিপয় ঝাড়ফুঁককারীর কাছেও যায়, কুরআন থেকে কিছু ঝাড়ফুঁক নেওয়ার জন্য। অথচ তারা জানে—সেই ঝাড়ফুঁককারী ব্যক্তিটি মিথ্যাবাদী। সে জিনের সাহায্য নেয় তার রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য। আপনি দেখবেন—অনেক রোগীই সেই জাদুকর সম্পর্কে নীরব থাকে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার উপকার করতে থাকে, তার সেই অবস্থার কথা কারও কাছে প্রকাশ করে না। কাউকে বলে না তার শির্‌কি কর্মকাণ্ডের কথা।

আসলে এই অসহায়-মিসকীন ব্যক্তিটি জানে না—এ কারণে তার চল্লিশ দিন সালাত আদায়ের সাওয়াব নষ্ট হয়ে গেছে। অপরদিকে সে যদি ঝাড়ফুঁককারীর কথা বিশ্বাস করে, তা হলে সে কুফরে লিপ্ত হয়। সুতরাং কোনো ঝাড়ফুঁককারী দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়—যারা ধর্ম এবং বার্ধক্যের ছদ্মবেশে নিজেদের ঢেকে রাখে, বাস্তবে তারা

---

[২] মুসলিম, ২২৩০।

[৩] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৯৫৩৬; আবূ দাঊদ, ৩৯০৪; তিরমিযি, ১৩৫।

জাদুকর, ভেলকিবাজ ও প্রতারক ছাড়া আর কিছু নয়। কিছু বিষয়ের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই জাদুকর ও ভবিষ্যৎ-বলে-দেওয়া প্রতারকদের চেনা সম্ভব। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্ট হলো—

- সে যদি আপনার নাম, আপনার মায়ের নাম জিজ্ঞেস করে—তা হলে বুঝবেন, সে জিনের মাধ্যমে সাহায্য নেবে।
- সে যদি আপনার কাছে একান্তই আপনার সম্পর্কিত কিছু চায়, যেমন : আপনার পরিধানকৃত কাপড়ের টুকরো—তা হলে জানবেন, সে জিনের মাধ্যমে সাহায্য নেবে।
- সে যদি আপনার কাছে তলব করে যে, আপনি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পশু জবাই করুন অথবা জবাইকৃত পশুর রক্ত আপনার শরীরে মাখতে বলে—তা হলে বুঝে নেবেন, জিনের সাহায্য নেবে সে।
- সে যদি আপনাকে কোনো কাগজ দেয়, যাতে লেখা থাকে বিভিন্ন চিত্রলিপি বা ভাঙা অক্ষর এবং কিছু আয়াতসহ গাণিতিক টেবিল ও দুর্বোধ্য শব্দ—তা হলে জানবেন, সে জিনের মাধ্যমে সাহায্য নেবে।
- আপনি যদি তাকে দেখেন যে, কুরআন তিলাওয়াতের মাঝেই সে এমন কথা বিড়বিড় করছে, যা অস্পষ্ট, বোঝা যায় না—তা হলে জানুন, জিনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে সে।
- সে যদি আপনাকে কিছু জিনিস দেয় জমিনে পুঁতে রাখার জন্য বা বাড়িতে গোপন করে রাখার জন্য—তা হলে জানবেন, সে জিনের সাহায্য নেবে।
- যদি দেখেন—সে আপনার এমন গোপনীয় কথা বলছে, যা আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না—তা হলে জানবেন, জিনের সাহায্য নিয়েই সে এগুলো বলছে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ করে—এই ঝাড়ফুঁককারী হলো একজন প্রতারক ও ভেলকিবাজ। কুরআন তিলাওয়াত করার মাধ্যমে সে নিজের আসল রূপ আড়াল করে রাখে মানুষের সামনে। কিন্তু বাস্তবে সে রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য জিনের সাহায্য নিয়ে থাকে। মানুষ এখন আগের তুলনায় অধিক শরণাপন্ন হয় গণক, জাদুকর ও জ্যোতিষীদের কাছে। বিশেষ করে ভেলকিবাজি ও জাদুবিদ্যা-সংক্রান্ত স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো খোলার পর। এগুলোর দরুন তাদের কাছে পৌঁছানো অত্যন্ত সহজ ও সুলভ হয়ে গেছে। এর ফলে অনেক মানুষ অনায়াসেই কবীরা গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে এবং জড়িয়ে পড়ছে আমল ধ্বংসকারী পাপকর্মে।

১২

মদ পান করা

ইসলামি শারীআত এসেছে সৃষ্টিজগৎকে আল্লাহ তাআলার গোলাম বানাতে আর প্রবৃত্তি ও শয়তানের গোলামি থেকে মুক্ত করতে। ইসলামি শারীআত আমাদের জন্য সকল উত্তম জিনিস হালাল করেছে এবং হারাম সাব্যস্ত করেছে সমস্ত মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়। ইসলাম যা হারাম করেছে, হালাল করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও কিছু মানুষ শারঈ এই হারামকে অস্বীকার করে এবং ক্ষতিকর ও খারাপ বিষয়ে অনড়ভাবে লিপ্ত থাকে। অপরদিকে নির্দ্বিধায় উত্তম ও হালাল বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করে।

শারীআত যা হারাম করেছে এবং যে সমস্ত গুনাহে জড়িত ব্যক্তিদের ওপর লা'নত করেছে, তার মধ্যে গুরুতর হলো—মদ পান করা। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশজন ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন—

ক) যে মদ উৎপাদন করে।

খ) যে উৎপাদন করায়।

গ) যে পান করে।

ঘ) যে সরবরাহ করে।

ঙ) যার জন্য সরবরাহ করা হয়।

চ) যে পরিবেশন করে।

ছ) যে বিক্রয় করে।

জ) যে এর থেকে উপার্জিত অর্থ খায়।

ঝ) যে ক্রয় করে এবং

ঞ) যার জন্য ক্রয় করা হয়।

১৩

সুদ খাওয়া

নেক আমল নষ্টকারী আরেকটি গুনাহ হলো—সুদের লেনদেন করা। আবূ ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) তার স্ত্রী আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি কয়েকজন মহিলার সাথে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, 'আপনাদের কী প্রয়োজন?' প্রথমেই তাঁকে উম্মু মাহাব্বাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি কি যাইদ ইবনু আরকাম সম্পর্কে জানেন?' আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হ্যাঁ।' উম্মু মাহাব্বাহ বললেন, 'আমি তার নিকট আমার একটি দাসী আটশ দিরহাম মূল্যের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করেছিলাম। অতঃপর তিনি সেই দাসীটি আবার বিক্রয় করতে চাইলে আমি নগদ ছয়শ দিরহাম দিয়ে তার থেকে তা ক্রয় করি।'

এ কথা শুনে আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, 'তুমি যা ক্রয় করেছ, তা কতই-না নিকৃষ্ট এবং যা বিক্রয় করেছ, তাও কতই-না নিকৃষ্ট! তুমি যাইদ (ইবনু আরকাম)-কে এই সংবাদ পৌঁছে দেবে—রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইকুম ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যে সমস্ত জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, তার সমস্ত সাওয়াব তিনি নষ্ট করে ফেলেছেন; যদি (এই সুদি লেনদেন থেকে) তাওবা না করেন।' তখন আমাদের সাথি উম্মু মাহাব্বাহ লা-জবাব হয়ে যান, ফলে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেননি তিনি।

এরপর একসময় স্বাভাবিক হয়ে তিনি বললেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন! আমি যদি আমার মূলধন-ই কেবল গ্রহণ করি, তা হলে সে ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কী?' তখন তিনি বললেন,

فَمَنْ جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ

'অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে এই নসীহত পৌঁছে যায় এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে সে বিরত হয়, তা হলে পূর্বে যা কিছু সে খেয়েছে, তা তার। (অর্থাৎ তাতে কোনো সমস্যা নেই।)'[১]

ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'সুদখোররা কিয়ামাতের দিন শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া পাগলের মতো (এলোমেলোভাবে) উঠতে থাকবে।' এটি হবে তাদের জন্য একটি নিদর্শন, যার মাধ্যমে কিয়ামাতের দিন অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদাভাবে তাদেরকে চেনা যাবে। এই সুদখোর শ্রেণিটি কবর থেকে ওঠার সময় বারবার পড়ে যেতে থাকবে, যেমন পড়ে যায় মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। তারপর এ ছাড়াও আরও কঠিন শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য।

কিয়ামাতের দিন সকল মানুষ কবর থেকে খুব দ্রুত বের হতে থাকবে, সুদখোর ব্যক্তিরাও দ্রুত বের হতে চাইবে। কিন্তু সুদ খাওয়ার কারণে তাদের পেট ফুলে যাবে, এমনকি পূর্ণ গর্ভবতী নারীর চেয়েও বেশি বড়ো হবে তাদের পেট। যখনই দ্রুত চলতে চাইবে, তখনই পড়ে যাবে। তখন তারা হবে উদ্‌ভ্রান্ত পাগলের ন্যায়—"তারা (কিয়ামাতের দিন) দাঁড়াবে ঠিক সেইভাবে, যেভাবে দাঁড়ায় ওই ব্যক্তি, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দিয়েছে।" এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَآ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

"হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ করো; যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। আর তোমরা যদি তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।"[২]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এই যুদ্ধ কি হত্যা ও ধ্বংসের যুদ্ধ? এটা কি অনাহারে মারার যুদ্ধ? দুর্যোগ ও ভূমিকম্পের যুদ্ধ? নাকি রোগ ও মহামারির যুদ্ধ? এটি কোন প্রকারের যুদ্ধ, আল্লাহ তাআলা তা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এখান থেকে ব্যাপক অর্থই বোঝা যায়; অর্থাৎ সব ধরনের যুদ্ধই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর অবাধ্য ও সুদখোর ব্যক্তিরা এর মোকাবিলা করবে। কাজেই তারা যেন তৈরি থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য!

---

[১] সূরা বাকারা, ২ : ২৭৫।
[২] সূরা বাকারা, ২ : ২৭৮-২৭৯।

১৪

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

বর্তমান যুগ যোগাযোগ ও যুক্ত থাকার যুগ। এখন দূরবর্তী সবকিছু চলে এসেছে খুব নিকটে। মানুষের মাঝে এখন তেমন কোনো দূরত্ব নেই। মানুষ যার সাথে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যে দেশের লোকের সাথে ইচ্ছা কথা বলতে পারে। সরাসরি দেখে এবং তার কথা শুনে সম্বোধন করতে পারে; যেন খুব কাছে বসেই গল্প করছে। ফলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এখন বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগাযোগও বেড়েছে সবার সাথে। কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যম যতই বেড়েছে, মানুষের সাথে সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আত্মীয়স্বজন ও রক্ত-সম্পর্কগুলোর সাথে যেন দূরত্ব ততই বেড়েছে।

আগে মানুষজন আত্মীয়দের সাথে এক জুমুআ বা দুই জুমুআ যোগাযোগ না করলেই, তাদের খোঁজখবর না নিলেই সমালোচনা করত। তারপর আস্তে আস্তে তা নেমে আসে এক মাস, দুই মাসে। আর এখন এক বছর, দুই বছরেও কেউ কারও খবর নেয় না, কোনো যোগাযোগ করে না। এখন এক আত্মীয় আরেক আত্মীয়ের সাক্ষাৎ আর পায় না তেমন। কোনো ঈদ বা বিবাহ কিংবা কারও জানাযার জন্য যখন সবাই একত্র হয়, কেবল তখনই দেখতে পায় সবাই সবাইকে। বর্তমানে সবার হাতে হাতে স্মার্টফোন আর যোগাযোগমাধ্যমও আগের চেয়ে কত উন্নত; তা সত্ত্বেও কেউ কারও খবর নেয় না।

নেক আমল ও ভালো কাজ ধ্বংসকারী কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো—আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তার কোনো আমল কবুল করা হবে না। তার কোনো নেক আমল দিয়ে উপকৃত হতে পারবে না সে।

১৫

কুকুর লালনপালন করা

কখনো কখনো মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা এবং ইবাদাত-বন্দেগি করা অত্যন্ত সহজ হয়। আবার কখনো তা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে কারও জন্য। তবে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বরং খুব করে খেয়াল করার বিষয় হলো—ইবাদাত করার পর এবং আনুগত্যে নিমগ্ন থাকার পর তা নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে সংরক্ষণ করা। আখিরাত দিবসে তা যেন বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত না হয়, সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক হওয়া।

একজন মুসলিম নেক আমল সঞ্চয় করতে বেশ ক্লান্ত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে নিয়মিত আদায় করতে অনেক কষ্ট করতে হয় তাকে। ফজরের সালাত যেন ছুটে না যায়, সেজন্য তার ত্যাগ অসামান্য। এভাবে সমস্ত পুণ্যময় কাজেই তাকে বিভিন্ন রকম কষ্ট আর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু এটা জানাও আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি যে—এমন কিছু গুনাহ আছে, যাতে লিপ্ত হওয়ার দরুন নেক আমলসমূহ বাতিল হয়ে যায়; হয়তো পুরোপুরি কিংবা কিছু অংশ। ফলে বিফলে যায় এই সব কষ্টস্বীকার আর দিন-রাতের বিরামহীন পরিশ্রম। সব বাতাসে ভেসে যায় ধূলিকণার মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে। আসলে আমল নষ্ট হয়ে যাওয়া অনেক ভয়াবহতার, অনুশোচনার ও অন্তহীন আফসোসের বিষয়।

নেক আমল ধ্বংসকারী গুনাহের মধ্যে একটি হলো—কুকুর লালনপালন করা। তবে শিকারী কুকুর কিংবা বাড়ি বা খেতখামার পাহারা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত কুকুর এর ব্যতিক্রম।

আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

"যে ব্যক্তি জীবজন্তু পাহারা দেওয়ার অথবা শিকার করার অথবা খেতখামার দেখেশুনে রাখার কুকুর ছাড়া (শখের বশে লালনপালন করার জন্য) অন্য কোনো কুকুর গ্রহণ করবে, তার সাওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কীরাত[১] পরিমাণ সাওয়াব কমে যাবে।"[২]

কুকুর পালা থেকে নিষেধ করার হিকমাহ বা রহস্য কী, সে সম্পর্কে ইমাম নববি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'কুকুর লালনপালন করলে প্রতিদিন কেন সাওয়াব কমে যায়, তার কারণ নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, কুকুরের কারণে তার ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করতে পারে না বলে। কারও মত হলো—পথচারী বা মানুষের কষ্ট হওয়ার দরুন। কেননা কুকুর তাদেরকে আতঙ্কিত করবে এবং তাড়া করে ফিরবে।

আবার কেউ বলেছেন, 'সাওয়ার কমে যাবে শাস্তিস্বরূপ, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও কেন সে তা গ্রহণ করল!' কুকুর গ্রহণ করলে সাওয়াব হ্রাস পাওয়ার হিকমাহ সম্পর্কে আরেক দল আলিমের অভিমত হলো—কুকুর পালনকারীর অজান্তেই হয়তো কুকুর তার বাসনপত্রে মুখ লাগিয়ে লালা মিশিয়ে দেবে আর সে তা পানি এবং মাটি দিয়ে পরিষ্কার করবে না। (ফলে নাপাক ও জীবাণুযুক্ত অবস্থাতেই থেকে যাবে সেগুলো।)'[৩]

কে আছে এমন ব্যক্তি, যে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ নেক আমল সঞ্চয় করতে পারে? সুতরাং ভাবুন—কেমন হবে সেই ব্যক্তির অবস্থা, যার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ সাওয়াব হ্রাস পায়?

---

[১] বিভিন্ন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'কীরাত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন সাহাবায়ে কেরাম (রদিয়াল্লাহু আনহুম)। জবাবে তিনি বলেছেন, "কীরাত হলো উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।" দেখুন—বুখারি, ৪৭; মুসলিম, ৯৪৫; আবূ দাঊদ, ৩১৬৮; তিরমিযি, ১০৪০। (অনুবাদক)

[২] বুখারি, ৩৩২৪; মুসলিম, ১৫৭৫।

[৩] নববি, শারহু মুসলিম, ১০/৩২৯।

১৮

স্বামীর কথা অমান্য করা

যে সমস্ত গুনাহ আমল নষ্ট করে দেয়, তার মধ্যে একটি হলো—শারঈ কোনো কারণ ছাড়া স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হওয়া। আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَّا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ أُذَانَهُمْ : اَلْعَبْدُ الْأٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَّهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

"তিন ধরনের মানুষের সালাত তাদের কানও অতিক্রম করে না (অর্থাৎ তা কবুল হয় না)—

ক) পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না ফিরে আসে।

খ) স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে যে নারী রাত অতিবাহিত করে।

গ) কোনো সম্প্রদায়ের ইমাম, লোকজন অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও যে তাদের ইমামতি করে।"[১]

এই তিন শ্রেণির ব্যক্তিদের সালাত গ্রহণ করা হয় না; তা সত্ত্বেও পুনরায় সালাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি তাদের প্রতি। কারণ সরাসরি সালাত বাতিল হয় না, বরং সালাতের সাওয়াব বাতিল হয়। যেমন নববি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—তাদের সালাতের কোনো প্রতিদান পাবে না তারা। এর সাওয়াব বাতিল হয়ে যাবে।'

এই কারণে স্ত্রীর ভয় করা উচিত—শারঈ কোনো ওজর ব্যতীত স্বামীর অবাধ্য হলে কিয়ামাতের দিন তার কোনো সালাত দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে না। স্ত্রীর খেয়াল রাখা উচিত—তার স্বামী কোনো কারণে কষ্ট পাচ্ছে কি না। স্বীমার যথাযথ খেদমত করা এবং নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে স্বামীকে খুশি রাখা স্ত্রীর কর্তব্য।

---

[১] তিরমিযি, ৩৬০।